"একজন সম্পূর্ণ দেবভাবাপন্ন ব্যক্তি হলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ একজন সম্পূর্ণ মানুষের আছে পরিপূর্ণ দেবত্ব। এটা ঠিক যে এখন মানবিক গুণাবলীর সামান্য অংশমাত্রই আমাদের আছে। অহংবোধের দ্বারা পরিচালিত হয় আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে কর্ম করি। আমরা বিশ্বাস করি না ঈশ্বর আমাদের শিক্ষার জন্য, আমাদের আনন্দলাভের জন্য এই সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। পাপ ও পুন্যকে আমরা আলাদ করে দেখি। সব জিনিসের মধ্যেই আমরা একটা উদ্দেশ্য খুঁজি এবং সেইমত নিজেদের ও অন্যান্য লোকের বিচার করি। ঈশ্বরের কাজ সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা কষ্ট পাই। আমরা নিজেরা আনন্দ উপভোগ করতে চাই, খেলা করতে চাই কিন্তু কিভাবে খেলতে হয় জানি না। আমরা অন্যদের বলি — "তোমার এটা করা উচিত হয়নি" আর নিজেকে বলি, "আমার এটা করা উচিত নয়, আমরা অবশ্যই এটা কোরবো না। সুতরাং আমরা কেন নিরামিষ ভোজী হবো?" হ্যাঁ, আমি জানি। আমি নিরামিষ ভোজী কারণ আমরা ভিতর যে ঈশ্বর আছেন তিনি এটা চান"

সুমা চিঙ হাই।

"যখন আমরা মুহুর্তের জন্যও বাক্যে চিন্তায় ও কর্মে অকৃত্রিম হই তখন মুহুর্তের জন্য হলেও দেব দেবীগণ দেবদূতগণম আমাদের সমর্থন করবেন। সেই মুহুর্তে সমস্ত পৃথিবী আমাদের করতলগত হয় ও আমাদের সমর্থন করে রাজত্ব করার জন্য সেখানে আমাদের সিংহাসন বিরাজ করছে।

সুমা চিঙ হাই।

কেন মানুষ অবশ্যই নিরামিষ ভোজী হবেন

কোয়ান-ইন পদ্ধতিতে দীক্ষা দানে অবশ্য প্রয়োজনীয় সর্ত হোলো আজীবন দুগ্ধ নিরামিষ ভোজী হতে হবে। উদ্ভিদ থেকে পাওয়া এবং দুগ্ধ থেকে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য কেবল খাওয়া যেতে পারবে। কিন্তু প্রাণীসূত্রে পাওয়া খাদ্যদ্রব্য যেমন ডিম খাওয়া নিষিদ্ধ। এর অনেক কারণ আছে। কিন্তু প্রথমম বাণীতেই বলা হয়েছে সমস্ত প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকতে হবে বা **"তুমি অবশ্যই প্রাণী হত্যা করবে না"।**

প্রাণী হত্যা না করা বা অন্যকোনভাবে প্রাণীর অনিষ্ঠ না করার অনেক সুফল আছে। এছাড়া অন্যের ক্ষতি না করা অনুরূপভাবে আমাদের নিজেদেরও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। কেন? কারণ কর্মের নিয়মই এই। "যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে" তুমি যখন প্রাণী হত্যা করতে চাও বা তোমার মাংস আহারের ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য অন্যকে দিয়ে প্রাণী হত্যা করাও তখন তুমি এক কর্মের ঋণ কর যা পরে অবশ্যই তোমাকে পরিশোধ করতে হবে। তাই নিরামিষ খাদ্যগ্রহণ আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। আমরা ভাল থাকি, কর্মের ঋণভার লাঘব হওয়ার ফলে আমাদের জীবনের মান উন্নত হয় সুক্ষ্ম ও আত্ম উপলব্ধির স্বর্গীয় জগতে আমাদের প্রবেশের পথ সুগম হয়। আপনাকে যা দিতে হয় তার তুলনায় এই প্রাপ্তি কি কম।

আমিষ খাদ্যগ্রহণের বিরুদ্ধে এই আধ্যাত্মিক যুক্তি অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়। কিন্তু আর কিছু লোক আছেন যাঁহারা নিরামিশ খাদ্য গ্রহণের পক্ষে কি কি যুক্তি আছে তাহা জানতে চান। এগুলো সাধারণ জ্ঞান থেকে এসেছে। আর সেগুলো হোলো ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবেশের ভারসাম্যরক্ষা, উপকথা, প্রাণী নির্যাতনও বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা প্রভৃতি।

মানুষের বির্বতন সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বাভাবিক ভাবেই নিরামিশ ভোজী ছিলেন। মানুষের শরীরের গঠন আমিষ ভোজনের উপযোগী নয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জি. এস. হান্টিংজেন শরীরের তুলনামূলক গঠন প্রবন্ধে এটা আলোচনা করে

দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমিষভোজীদের ছোট আকারের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র আছে। তাদের বৃহদান্তর হলে আকারে বড়ো ও মসৃণ। বিপরীতভাবে নিরামিষ ভোজীদের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র দুটোই দীর্ঘাকার। মাংস অধিক পরিমাণে প্রোটিন ও অল্পপরিমাণে তন্তু থাকার ফলে মাংস থেকে পুষ্টি শোষণ করার জন্য অন্ত্রগুলোর খুব বেশী সময় লাগে না। সেজন্য মাংসাশীদের অন্ত্রগুলো নিরামিষ ভোজীদের অন্ত্র অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ছোট।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

মানুষের বির্বতন সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় আমাদের পূর্বপুরুষের স্বাভাবিক ভাবেই নিরামিষ ভোজী ছিলেন। মানুষের শরীরের গঠন আমিষ ভোজনের উপযোগী নয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জি. এস. হান্টিংজেন শরীরের তুলনামূলক গঠন প্রবন্ধে এটা আলোচনা করে দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে আমিষভোজীদের ছোট আকারের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র আছে। তাদের বৃহদান্ত্র হলে আকারে বড়ো ও মসৃন। বিপরীতভাবে নিরামিশ ভোজীদের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র দুটোই দীর্ঘাকার মাংস অধিক পরিমাণে প্রোটিন ও অল্প পরিমাণে তন্তু থাকার ফলে মাংস থেকে পুষ্টি শোষণ করার জন্য অন্ত্রগুলো নিরামিষ ভোজীদের অন্ত্র অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে ছোট।

নিরামিষ ভোজীদের মত মানুষেরও স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্র আছে। আমাদের অন্ত্রগুলোর দৈর্ঘ্য আনুমানিক আটাশ ফুট (সাড়ে আট মিটার)। ক্ষুদ্রান্ত্রটি আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হয় এবং এটা মসৃন নয় এবং কুণ্ডলীপাকান। মাংসাশী প্রাণীদের চেয়ে দীর্ঘ হওয়ার ফলে আমাদের অন্ত্রগুলোতে মাংস দীর্ঘসময় ধরে থাকে। ফলে মাংস পচে যায় ও বিষাক্ত হয়। এই বিষ মলদ্বারে ক্যানসারের কারণ। তাছাড়া ইহা আমাদের যকৃতের ভার বাড়ায়। এতে যকৃতের প্রদাহ এবং ক্যানসারের সৃষ্টি হতে পারে।

মংসে প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত প্রোটিন ও ইউরিয়া আছে যা যকৃতকে ভারাক্রান্ত করে এবং যকৃতের কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে দিতে পারে। এক পাউণ্ড মাংস প্রায় চৌদ্দ গ্রাম বিষাক্ত প্রোটিন থাকে। যখন সজীব কোষ গুলো এই বিষাক্ত প্রোটিন সম্পৃক্ত হয় তখন তাদের প্রকৃতির পরিবর্তন হয় তাছাড়া মাংসে

সেলুলোজের পরিমাণ কম থাকার ফলে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। আর সকলেই জানেন কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে মলদ্বারের ক্যানসার বা অর্শের উৎপত্তি হয়।

মাংসের মধ্যে দ্রবীভুত চর্বি ও কোলেষ্টেরোল হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সৃষ্টি করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এবং এখন ফরমোজাতেও মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হোলো হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান হোলো ক্যানসার গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে মাংস ঝল্‌সালে বা রোষ্ট করলে মাংসে একরকম রাসায়নিক দ্রব্য (Methyl Cholonthrne) তৈরী হয় একটা তীব্র বিষ। ইঁদুরের উপর এই বিষ প্রয়োগ করে দেখা গেছে এটা হাড়ের টিউমার, রক্তের ক্যানসার, পাকস্থলীর ক্যানসার প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে বুকের ক্যানসার আছে এমন মায়ের দুধ খেলে বাচ্চা ইঁদুরের ও ক্যানসার হয়। মানুষের শরীরের ক্যানসারের কোষ প্রাণীর শরীরে ইন্‌জেক্‌সান দেওয়া হলে প্রাণীদেরও ক্যানসার হয়। আমরা রোজ যে মাংস খাই তা যদি এরকম অসুস্থ প্রাণীদের হয় তাহলে আমাদের সে সমস্ত অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনেক মনে করেন মাংস পরিস্কার ও নিরাপদ কারণ কসাইখানাগুলো নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। কিন্তু রোজ যতসংখ্যক গরু, শুকর বা মুর্গী প্রভৃতি হত্যা করা হয় তাদের প্রত্যেককে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেককে পরীক্ষা করা হলেও কোনও একটা মাংসের টুকরায় ক্যানসার আছে কিনা তা পরীক্ষা করা অত্যন্ত দুষ্কর। সম্প্রতি খারাপ অংশটুকু যেমন পা বা মাথা কেটে বাদ দিয়ে বাকী অংশটুকু বিক্রয় করা হয়।

বিখ্যাত নিরামিষ খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডঃ জে. এইচ. কেলগ্ বলেছেন, "আমরা যখন নিরামিষ খাদ্য খাই তখন কিভাবে সেই আনাজটি মরে গেছে তা আমাদের জানার দরকার নেই এত আমরা আনন্দের সংগে আহার করতে পারি।

আর একটা জিনিসও ভাবার আছ। বিভিন্ন জীবানুনাশক ঔষধ ষ্টেরয়েড বা হরমোন প্রভৃতি হয় প্রাণীর খাদ্যের সংগে মিশিয়ে দেওয়া হয় অথবা সরাসরি প্রাণীদেহে ইঞ্জেকসান দেওয়া হয়। জানাগেছে এইসব প্রাণীদের মাংস আমরা

আহার করলে সেই আমরাও এই সমস্ত আমাদের শরীরে গ্রহণ করি। ফলে মাংসের জীবানুনাশক ঔষধগুলো মানুষের জীবানুনাশক ঔষধের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়।

কিছু কিছু লোক মনে করেন নিরামিষ খাদ্য যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়। ডাঃ মিলার নামে একজন আমেরিকান শল্যচিকিৎসক দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল ফরমোজায় চিকিৎসা করেন। তিনি সেখানে একটা হাসপাতাল করেছেন যেখানে রোগী ও কর্মচারী সকলের জন্যই নিরামিষ খাদ্যের ব্যবস্থা আছে। ইঁদুর হচ্ছে এমন একটা প্রাণী যে আমিষ বা নিরামিষ দুরকম খাবার খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে। এখন যদি দুটো ইঁদুরকে আলাদা আলাদা রেখে একটাকে নিরামিষ ও অন্যটিকে আমিষ খাবার খেতে দেওয়া হয় তাহলে তেখা যায় তাদের দুজনেরই, পৃদ্ধির পরিমাণ একই রকম, কিন্তু নিরামিষ খাদ্য গ্রহণকারী ইঁদুর বেশীদিন বাঁচে আর তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। তাছাড়াও দুটো ইঁদুরই যদি অসুস্থ হযে পড়ে তাহলে নিরামিষ ভোজী ইঁদুর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।" আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের যে ঔষধ দেয় তার অনেক উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা শুধু আমাদের অসুখ সারায়। খাদ্য কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারে।" "মাংস অপেক্ষা উদ্ভিদখাদ্য বেশী প্রত্যক্ষভাবে আমাদের পুষ্টি যোগায়" — তিনি বলেছেন। মানুষ পশুমাংস আহার করে, কিন্তু আমাদের খাদ্য পশুর পুষ্টির সূত্রে হলো উদ্ভিদ। অধিকাংশ প্রাণী স্বল্প দিন বাঁচে এবং মানুষের সব রকম রোগই প্রাণীদের হয়। রোগাক্রান্ত প্রাণীদের মাংস আহার করেই সম্ভবত মানুষদের এইসব রোগ হয়েছে। সুতরাং মানুষ কেন গাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে পুষ্টিলাভ করবে না। ডাঃ মিলার বলেছেন — "স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য যা পুষ্টি দরকার তা আমরা দানাশষ্য শুটি ও শাকসব্জি থেকেই পেতে পারি।

অনেকের ধারণা আছে যে উদ্ভিদ প্রোটিন থেকে প্রাণী প্রোটিন উৎকৃষ্ট কারণ উদ্ভিদ প্রোটিন অসম্পূর্ণ আর প্রাণী প্রোটিন সম্পূর্ণ। আসল কথা হোলো এই যে কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রোটিন সম্পূর্ণ আর কয়েকটি অসম্পূর্ণ উদ্ভিদ প্রোটিন মিশিয়ে সুষমম প্রোটিন খাদ্য প্রস্তুত করা যায়।

আমেরিকার খাদ্য সংস্থা ১৯৮৮ সালের মার্চমাসে ঘোষণা করেছেন যে পরিকল্পনামত উপযুক্তভাবে গ্রহণ করতে পারলে স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিকারতার

বিচারে নিরামিষ খাদ্য বেশী উপযোগী।

এমন একটি মিথ্যা ধারণা আছে যে মাংসভোজীরা নিরামিষ ভোজীদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী, কিন্তু ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আরভিন্ ফিশা ৩২ জন নিরামিষ ভোজী ও ১৫ জন আমিষ ভোজী মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে মাংসভোজীদের চেয়ে নিরামিষ ভোজীদের সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশী। তিনি এদের যতক্ষন সম্ভব হাত উঁচু করে রাখতে পলেচিলেন। এ পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত পরিস্কার। ১৫ জন মাংসভোজীদের মধ্যে মাত্র ২ জন পনেরো থেকে ত্রিশ মিনিট তাদের হাত উঁচু করে রাখতে পেরেছিলো। ৩২ জন নিরামিষ ভোজীদের ২২ জন পনেরো থেকে ত্রিশ মিনিট, ৯ জন এক ঘন্টার বেশী, ৪ জন ২ ঘন্টার বেশী ও এক জন তিন ঘন্টার বেশী হাত উঁচু রাখতে পেরেছিলো।

অনেক দীর্ঘদূরত্বের দৌড়বীর প্রতিযোগিতার পূর্ব্বে কয়েকদিন নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করেন। বিখ্যাত নিরামিষ খাদ্যে বিশ্বাসী ডঃ বারবারা মোর সাতাশ ঘন্টা তিরিশ মিনিটে একশত দশমাইল দৌড় শেষ করেছিলেন। ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সী এক মহিলা কমবয়সীদের সমস্ত রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আমি একটা আদর্শ হতে চাই যাতে লোকে জানতে পারে যে যারা নিরামিষ খাদ্য খায় তাহারা শক্তিশালী দেহ, স্বাস্থ্য মন ও নির্মল জীবন যাপনে সক্ষম।

নিরামিষ ভোজীগণ কি তাঁহাদের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন পান? বিশ্ব স্বাস্থ্য সুপারিশ করেছেন যে আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরীর ৪.৫% প্রোটিন থেকে পাওয়া যায়। গমের প্রোটিন ১৭% ক্যালরী, চালে ৪% ক্যালরী আছে আর broccoli তে আছে ৪৫% ক্যালরী। মাংস না খেয়েই প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য পাওয়া খুব সহজ। অধিক চর্বিযুক্ত আমিষখাদ্য আহারের ফলে ক্যানসার, হৃৎপিণ্ডের নানা অসুখ হতে পারে তাই এগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নিরামিষ খাদ্যগ্রহণ ভালো। মাংস ও অতিমাত্রায় চর্বিযুক্ত অন্যান্য প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণের সংগে হৃৎপিণ্ডের অসুখ, স্তন এবং অন্ত্রের ক্যানস্র, উচ্চ রক্তচাপজনিত অসুখের সম্পর্ক আছে একথা প্রমাণিত। কম চর্বিযুক্ত খাদ্য ও নিরামিষ খাদ্য খেলে যে অসুখগুলো প্রতিবোধ করা এমনকি আরোগ করা সম্ভব সেগুলো হোলো মূত্রাশয়ে পাথুরী, প্রস্টেটের ক্যানসার, বহুমূত্র, পাকস্থলীর ক্ষত, কোষ্ঠবদ্ধতা, উচ্চ রক্ত চাপ অ্যাজমা, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি

ধূমপান ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার এর থেকে বড় ঝুঁকি আর কিছুতেই নেই।

পরিবেশ ও তাহার ভারসাম্য

মাংসের জন্য প্রাণীহত্যার পরবর্তী কুফল আছে। ইহার ফলে বৃষ্টি-অবশ্য ধ্বংস হয়, পৃথিবীর তাপমাত্র বৃদ্ধিপায়, জলদুষণ ও জল সংকট হয়, বন ধ্বংস হয়, শক্তির উৎসের অপব্যবহার হয় ও পৃথিবীব্যাপী ক্ষুধার সমস্যা দেখা দেয়। মাংস উৎপাদনের জন্য ভূমি, জল, শক্তি ও মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার ব্যবহার পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহারের উপযুক্ত পদ্ধতি নয়। ১৯৬০ সাল থেকে মধ্য আমেরিকার ২৫% বৃদ্ধি অবশ্য গোচারণ ভূমি তৈরী করার জন্য হয় পুড়িয়ে ফেলা হযেছে অথবা কেটে ফেলা হয়েছে। অনুমান করা হয় যে প্রতি চার আউন্স পশুমাংস তৈরী করতে গিয়ে ৫৫ বর্গফুট ক্রান্তীয় অরণ্য ধ্বংস করতে হয়। তাহারা ক্রমবদ্ধমান পশুপালনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারক তিনটি গ্যাসের উৎপাদন পৃদ্ধি করে এবং জলদূষণ ঘটায়। এক পাউণ্ড গোমাংস উৎপাদন করতে গিয়ে ২৪৬৪ গ্যালন জল লাগে অপরপক্ষে এক পাউণ্ড টমেটো জন্মাতে ২৯ গ্যালন জল লাগে আর এক পাউণ্ড রুটীর গম তৈরী করতে গিয়ে ১৩৯ গ্যালন জল লাগে। গোমহিষাদি প্রাণী ও অন্যান্য পশু উৎপাদনের জন্য আমেরিকার জলসম্পদের প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয হয়।

পশুর পরিবর্তে শষ্য উৎপাদনের জন্য পৃথিবীর সম্পদ ব্যবহার করলে আরও অনেক লোকের খাদ্যের সংস্থান করা সম্ভব হোতো। এক একর পরিমাণ জমিতে উৎপাদিত সব পশুর পরিবর্তে মানুষ খেলে ৮ গুন বেশী প্রোটিন ও ২৫ গুন বেশী ক্যালী উৎপন্ন হোতো। এরকম অসংখ্য পরিসংখ্যান আছে। পশুপালনের জন্য ব্যবহৃত জমি মানুষের খাদ্যশষ্য উৎপাদনে ব্যবহার হলে পৃথিবীর সম্পদকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করা যেতো।

নিরামিষ খাদ্য আহার আপনাকে এই পৃথিবীতে আরও সহজভাবে চলফেরা করতে সাহায্য করত। পরিমিত আহার ও বাহুল্য বর্জন করলে আপনার মনে হবে প্রতিবার খাদ্যগ্রহণের সংগে সংগে মানুষকে [illegible] হবে না

বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা পৃথিবীর প্রায় এক বিলিয়ান লোক ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে কষ্ট পাচ্ছে। অনাহারে মারা যায় প্রতিবৎসর ৪ কোটী লোক যাদের অধিকাংশই শিশু। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর উৎপন্ন দানা শস্যের এক তৃতীয়াংশ মানুষের পরিবর্তে পশুদের

খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের ৭০ পশু খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। আমরা যদি পশুর পরিবর্তে মানুষদের খাওয়াতে পারি তাহলে কেউ আর ক্ষুধার্ত থাকবে না।

প্রাণী হত্যা

আপনি কি জানেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন লক্ষাধিক পশুহত্যা করা হয়? পশ্চিমের অধিকাংশ দেশগুলিতেই খামার বাড়ীতে পশু পালন করা হয় । এর উদ্দেশ্য হোলো যত সম্ভব কম সময়ে যত সম্ভব বেশী প্রাণী হত্যার জন্য সংগ্রহ করা। প্রাণাগুলিকে একজায়গায় দলবদ্ধভাবে পালন করা হয়, তাদের অঙ্গবিকৃতি করা হয় ও তাদের যন্ত্রের মত ব্যবহার করা হয়; উদ্দেশ্য হোলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেশী মাংস পাওয়া। এ দৃশ্য চোখে দেখার মত নয়। তাই বলা হয়, "কষাইখানা একবার দেখলে আপনি আজীবন নিরামিষ ভোজী হয়ে যাবেন"।

লিও চলস্টয় বলেছেন" — যতিদিন কষাইখানা থাকবে ততদিন যুদ্ধ হবে। নিরামিষভোজন হোলো মানবিকতার পরীক্ষা"। যদিও আমরা সক্রিয়ভাবে প্রাণীহত্যার সমর্থন করিনা তবুও সমাজস্বীকৃত প্রথা হিসাবে আমরা মাংস খাই, প্রাণীদের প্রতি কি করছি সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়েই আমরা মাংস আহার করি।

ইতিহাসের শুরু থেকে আমরা দেখতে পাই যে নিরামিষ খাদ্যই মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য। প্রাচীন গ্রীক ও হিব্রু রূপকথায় ফলাহারী মানুষের কথা বলা হয়েছে। প্রাচীন। মিশরীয় ধর্মযাজকগণ কখনও মাংস খেতেন না। প্রেটো, ডায়োজেনিস, মক্রেটিসের মত বড় বড় দার্শনিকগণ নিরামিষ আহারেরে স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

ভারতে শাক্যমুমি বুদ্ধ অহিংসার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন যার মুলকথা হোলো কোন জীবিত প্রাণীর অনিষ্ট না করা। তিনি তাঁর শিষ্যদের মাংস আহার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন কারণ তা না হলে অন্য প্রাণীরা তাদের ভয় করবে। বুদ্ধ এইরকম মন্তব্য করেছেন,'' মাংস আহার হোলো একটা অর্জিত অভ্যাস। প্রথমেই এই ইচ্ছা নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি না।'' ''মাংসাহারী লোকেরা তাদের অন্তরের মহান করুণার বীজ নষ্ট করে দেয়।''

''মাংসাহারী লোকেরা পরস্পরকে হত্যা করে ও পরস্পরকে আহার করে,'' এই জন্মে আমি তোমাকে খাচ্ছি এবং পরজন্মে তুমি আমাকে খাবে এবং টো এইভাবে চলবে তাদের মোহমুক্তি ঘটবে কি করে?''

অনেক প্রাচীন তাওবাদী, খ্রীষ্টান ও ইহুদী নিরামিষভোজী ছিলেন। পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, ''**তোমাদের আহারের জন্য আমি সব রকমের শষ্য ও ফল রেখেছি আর সমস্ত বন্যপ্রাণী ও পাখীদের খাদ্যের জন্য আমি রেখেছি তৃণ ও লাতাপাতা,**'' (জেনোস ১:২৯) মাংস ভক্ষনকে নিষিদ্ধ করে বাইবেলের অন্যান্য উদাহরণ — ''যাতে রক্ত আছে এমন মাংস তুমি অবশ্য খাবে না কারণ রক্তে প্রাণ আছে'' (জেনেসিস ৯:৪) আমাকে দেওযার জন্য কে তোমাকে বলদ বা ভেড়া কাটতে বলছে ? এই নিষ্পাপ রক্ত ধুয়ে ফেল যাতে আমি তোমার প্রার্থনা শুনতে পাই। তা নাহলে আমি মুখ ফিরিয়ে নেবো কারণ তোমার হাত রক্তমাখা। এরজন্য অনুতাপ কর যাতে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি।'' যীশুর এক শিষ্য সেন্ট পল রোমানদের উদ্দেশ্য এক চিঠিতে লিখেছেন, ''**মদ খাওয়া অথবা মাংস খাওয়া কোনটাই ভালো না**''।

সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ এমন অনেক পুস্তক আবিষ্কার করেছেন যা যীশু ও তাঁর বাণী সম্পর্কে নূতনভাবে আলোকপাত করে। তিনি বলেছেন — ''**যারা প্রাণী মাংস আহার করে তারা নিজেরাই কবরে যায়। আমিম খুব সততার সংগেই বলছি যে যারা হত্যা করে তারা নিহত হয়। যারা জীবিত প্রাণী হত্যা করে ও তাদের মাংস আহার করে তারা মৃত ব্যক্তিদের মাংসই ভক্ষন করে।**''

ভারতীয় ধর্মেও মাংস ভক্ষনকে বর্জন করা হয়েছে। বলা হয় যে ''**প্রাণী হত্যা না করে লোকে মাংস পায় না। যে ব্যক্তি নিরীহ প্রাণী হত্যা করে সে**

কখনও ঈশ্বরের অনুগ্রহ পায় না। তাই মাংস ভোজন বন্ধ করে'' (হিন্দুধর্মের উপদেশ)

ইসলাম ধর্মগ্রন্থ কোরান **মৃত পশু, রক্ত ও মাংস ভক্ষন** নিষেধ করেছেন।

একজন বিখ্যাত জৈনিক ধর্মগুরু হান-সান-জু কঠোরভাবে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ করে কেটা কবিতা রচনা করেছেন। ''যাও তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়ে মাছ মাংস নিয়ে এস তোমার স্ত্রী ও শিশুদের আহারের জন্য। কিন্তু তোমাদের আহারের জন্য তাদের জীবন নেওয়া হবে কেন? এটা অযৌক্তিক। এতে তোমাকে স্বর্গের দিকে নিয়ে যাবে না বরং তোমাকে নরকের আবর্জনায় পরিণত করবে।''

অনেক বিখ্যাত লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং বিখ্যাত ব্যক্তি নিরামিষ ভোজী ছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগন সকলেই নিজের আগ্রহেই নিরামিষ ভোজী হয়েছিলেন। শাক্যমুনি বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, ডার্জিল , হোরেস প্লেটো, পেত্রার্ক, পীথাগোরাস, সক্রেটিস, সেক্সপীয়ার, ভলতেয়ার, নিউটন, লিওনার্দ্দো-দ্যা-ভিঞ্চি, চার্লস ডারউইন্, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, এমারসন, হেনরী ডেভিড থ্যুরো, এমিল জোলা, বার্নাড্ রাসেল, রিচার্ড ওয়েগনার, পি. বি. শেলী, এইচ্ . জি. ওয়েলস্, অলবার্ট আইনস্টাইন, রবন্দ্রীনাথ ঠাকুর, লিও তলষ্টয়, জর্জ বার্নাড শ, মহাত্মা গান্ধী, আলবার্ট স্যইজার এবং আরও সাম্প্রতিক কালে পল নিউম্যান, ম্যাডোনা, প্রিন্স ডায়ানা, লিন্ডসে ওয়েগনার, পল ম্যাক্কার্টনী এবং ক্যানডিস্ বার্জেন এদের কয়েকটি মাত্র নাম।

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, ''আমি মনে করি মানুষের চারিত্রিক গুনাবলীর উপর নিরামিষ খাদ্য যে পরিবর্তন আনে তা মানুষের পক্ষে কল্যান কর। তাই নিরামিষ ভোজী হওয়া মানুষের পক্ষে শুভ এবং শান্তির কারণ। ইতিহাসে বহু বিখ্যাত চরিত্র ও সাধুসন্তদের ইহাই সাধারণ উপদেশ।

প্রভু প্রশ্নের উত্তর দিলেন

প্রশ্ন ঃ—মাংস ভক্ষনের অর্থ প্রাণী হত্যা, কিন্তু শাক্সব্জী আহারও একপ্রকার হত্যা নয় কি?

প্রভু ঃ—শাক্সব্জী ভক্ষনও এক ধরনের হত্যা এবং এর ফলে কর্মফলজনিত কিছু বাধা সৃষ্টি করবে। কিন্তু এর ফল অতি সামান্য। যদি কোনও ব্যক্তি কোয়ান-ইন্ পদ্ধতিতে প্রতিদিন আড়াই ঘন্টা যোগাভ্যাস করেন তবে এই কর্মফলের হাত থেকে পরিত্রান পাওয়া যাবে। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যেমন আহার করতে হবে তেমনি এমন খাদ্য আমাদের নির্বাচন করতে হবে যা সর্বাপেক্ষা কর্মচেতন এবং কম অনিষ্টের কারণ হয়। উদ্ভিদে আছে ৯০% জল তাই তাদের চেতনার পরিমান এত অল্প যে তারা প্রায় কোন যন্ত্রনা উপলব্ধি করে না। তাছাড়া অনেক শাক্সব্জী আছে যা আমরা খাদ্যহিসাবে গ্রহণ করার সময় তাদেস শিকড় কেটে দিই না। বরং তাদের শাখাপ্রশাখা ছেঁটে দিয়ে আমরা তাদের বংশ বিস্তারের সাহায্য করি। এতে শেষ পর্যন্ত াছপালার উপকারই হয়। সেইজন্য উদ্ভিদ বিশারদ্গন বলেন যে গাছ ছেটে দিলে গাছ আরও বড়ো ও সুন্দর হয় ফলের ক্ষেত্রে এটা আরও ভলোভাবে দেখা যায়। ফল যখন পাবে তখন ইহা সুগন্ধ সুন্দর রং ও আস্বাদ দ্বারা লোকেক আকর্ষণ করে। এইভাবে গাছ তাদের বিস্তির্ন এলাকায় তাদের বীজ বিস্তার কাজ করে। আমরা যদি তাদের না খেতাম তাহলে তারা পেকে পড়ে যেত ও পচে যেত। সূর্যের আলো না পাও যায় বীজ নষ্ট হয়ে যেত। সুতরাং শাকসব্জী ও ফল খাওয়া একটা স্বাভাবিক প্রবণতা এবং এতে তাদের কোনও কষ্ট হয় না।

প্রশ্ন ঃ—অধিকাংশ লোকের ধারণা আছে যে নিররামিষ ভোজীরা ক্ষুদ্রাকৃতি ও কৃশ এবং আমিষ ভোজীরা দীর্ঘকায় ও স্থূলাকৃতি. এটা কি ঠিক?

প্রভু ঃ—নিরামিষ ভক্ষণ কারীরা আবশ্যিকভাবে কৃশকায় ও ক্ষুদ্রাকৃতি হবে এটা ঠিক নয়। খাদ্য সুষম হলে তারাও দীর্ঘকায় ও বলবান হতে পারে। যেমন দেখ হাতী, গবাদি পশু, জিরাফ, জলহস্তী — এরা শুধুমাত্র গাছপালা ওফল আহার করে কিন্তু তারা মাংসাশীদের বেশী বলবান, শান্তশিষ্ট ও মানুষের উপকারী। কিন্তু মাংসাশী প্রাণীরা অনেক বেশী উগ্র ও মানুষের কোনও কাজে লাগে না। মানুষও যদি প্রাণী ভক্ষন করে তবে প্রাণীদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট লাভ করে। মাংস ভক্ষনকারী মানুষ যে আবশ্যিকভাবে দীর্ঘকায় ও বলবান হবে তা নয় কিন্তু তাদের গড় আয়ুষ্কাল কম। এস্কিমোর প্রায় পরিপূর্ণভাবে মাংসাশী কিন্তু তারা কি দীর্ঘকায় ও বলবান? তারা কি দীর্ঘজীবি? এটা তোমরা নিশ্চয়ই ভালোভাবে বুঝতে পারো।

প্রশ্ন ঃ—আমিষ ভক্ষনকারীরা কি ডিম খেতে পারে ?

প্রভু ঃ—না, আমরা যখন ডিম খাই তখনও আমরা প্রাণী হত্যা করি, কেহ কেহ বলেন যে বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া ডিম নিষিক্ত নয় তাই এই ডিম খেলে প্রাণী হত্যা হয় না। এটা শুধু আপাত দৃষ্টিতে সত্যি। ডিমগুলো অ-নিষিক্ত থাকে কারণ নিষিক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় পরিবেশ স্থগিত রাখা হয়। সেজন ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অসম্পূর্ণ থাকে। যদিও এইসব অবস্থাগুলো ঘটে না। এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রানশক্তি এতে থাকে। আমরা জানি ডিমের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রাণশক্তি আছে অন্যথায় শুধুমাত্র নিষিক্ত করা যায় কেন? কেউ কেউ বলেন ডিমে মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি, প্রোটিন ও ফস্ফরাস আছে। কিন্তু শুঁটি, দই প্রভৃতি প্রোটিন এবং আলু প্রভৃতি কন্দ থেকেও তো ফস্ফরাস পাওয়া যায়। প্রাচীনকাল থেকেই আমরা জানি অএনক সাধু সন্ন্যাসী ডিম বা মাংস খেতেন না তবু তাঁরা দীর্ঘায়ু ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ প্রভু ইং গুয়াং ভাত ও একবাটী তরকারী খেতেন, তবু নব্বুই বছর বেঁচেছিলেন। তাছাড়া ডিমের কুসুমে প্রচুর পরিমাণে কোলেস্টোরেল আছে যা নানা হৃৎযন্ত্রে পীড়ার কারণ যা ফরমোজা ও আমেরিকার মৃত্যুর প্রধান কারণ। আমরা অবাক হবো না যদি আমরা দেখি তাদের অধিকাংশই ডিম খায়।

প্রশ্ন ঃ—মানুষ হাঁস মুরগী, শূকর, গরু প্রভৃতি পালন করে। তবে আমরা তাদের ভক্ষন করবো না কেন?

প্রভু ঃ—এই কথা? মা-বাবা তো শিশুদের পালন করেন। তাহলে কি মা-বাবার শিশুদের ভক্ষন করার অধিকার আছে ? প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর বাঁচার অধিকার আছে এবং কাহাকেও এথেকে বঞ্চিত করা যাবে না। হংকং এর আইন যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে এমন কি আত্মহত্যা করাও আইন বিরোধী। সুতরাং অন্য জীবিত প্রাণী হত্যা আরও কত আইন বিরোধী ?

প্রশ্ন ঃ—প্রাণীরা মানুষের খাদ্য হওয়ার জন্যই জন্মায়। আমরা যদি তাদের ভক্ষন না করতাম তাহলে তারা পৃথিবী ভরিয়ে ফেলতো, তাই না?

প্রভু ঃ—এটা একটা অবাস্তব ধারণা কোন প্রাণীকে হত্যা করার আগে তুমি কি তাকে জিজ্ঞাসা করো তাকে হত্যা করা হবে কিনা বা তাকে খাওয়া হবে কিনা? সমস্ত জীবিত প্রাণীই বাঁচতে চায় ও মরতে ভয় পায়। আমরা চাই না আমাদের বাঘে খাক্ তেমনি কোন প্রাণীই চায় না মানুষ তাদের খাক্। প্রায় দশ হাজার বছর হলো মানুষ পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু মানুষ আসার আসে অনেক প্রজাতির প্রাণীই পৃথিবীতে ছিল। তারা কি পৃথিবীতে অতিজনাকীর্ণ ছিল? সমস্ত প্রাণীই পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। যখন পৃথিবীতে খাদ্য কম থাকে এবং স্থান সীমাবদ্ধ থাকে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাপক জনসংখ্যা হ্রাস ঘটে। এর ফলে জনসংখ্যা উপযুক্ত পরিমানে থাকে।

প্রশ্ন ঃ— আমি নিরামিষ ভোজী হব কেন?

প্রভু ঃ—আমি নিরামিষ ভোজী কারণ আমার অন্তরের ঈশ্বর তাহাই চান। বুঝলে? মাংস ভক্ষন হত না হওয়ার বিশ্বজনীন নীতির পরিপন্থী। আমরা নিজেরা যেমন নিহত হতে চাই না তেমনি আমরা চাই না কেউ আমাদের চুরি করে হত্যা করুক। এখন আমরা যদি অন্য ব্যক্তির প্রতি এই ব্যবহার করি তাহলে আমরা নিজেদের বিরুদ্ধেই কাজ করবো এবং তার ফলভোগ আমরা কোরবো। অন্যের প্রতি যে ব্যবহার তুমি করবে তার ফলভোগও তুমি করবে। তুমি নিজেকে যেমন কামড়াতে পারো না তেমনি নিজের বুকে ছুরিমারতেও পারো না। সেইভাবে তোমার কাউকে হত্যা করা উচিত নয় কারণ তা হোলো জীবধর্মের বিরুদ্ধে। আমরা বুঝি না যে এর জন্য আমরা কষ্ট পাই। এর অর্থ এই নয় যে আমরা যে কোন উপায়ে নিজেদের সীমিত রাখবো, এর অর্থ হোলো জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রসারিত করবো। এই দেহের শুধু আমাদের জীবন

সীমিত থাকবে না, সমস্ত প্রাণীর প্রতিই ইহা প্রসারিত হবে। ইহা আমাদের আরও সুন্দর আরো মহৎ, আরো সুখী ও উদার করে।

প্রশ্ন ঃ—আপনি কি নিরামিষ খাদ্য সম্পর্কে এবং ইহা কিভাবে বিশ্বশান্তির সহায়ক সেবিষয়ে কিছু বলবেন কি?

প্রভু ঃ—নিশ্চয়ই। দেখ পৃথিবীতে যে সব যুদ্ধ হয়েছে তাদের অধিকাংশের কারণই হলো অর্থনৈতিক সমস্যাবলী। আমরা এগুলোর মুখোমুখি হবো। যখন পৃথিবীতে ক্ষুধা খাদ্যাভাব দেখা দেয় অথবা বিভিন্ন দেশের মধ্যে খাদ্যের অসম বন্টন ঘটে তখন দেশের অর্থনৈতিক সংকট জরুরী হয়ে দেখা দেয়। যদি তুমি নিরামিষ খাদ্য সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণার ফল অথবা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পড়া সময় পাও তাহলে তুমি এটা ভালভাবে বুঝতে পারবে। মাংসের জন্য হাঁসমুরগী বা পশুপালন আমাদের অর্থনীতিকে দউলিয়ে করে দিয়েছে। ইহা সারা পৃথিবীতে। অন্ততঃপক্ষে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ক্ষুধার সৃষ্টি করেছে। আমি শুধু এটা বলছি না। একজন আমেরিকা নাগরিক এ-বিষয়ে গবেষণা করেছেন এবং একটি বইও লিখেছেন। তুমি যেকোন বই-এর দোকানে গিয়ে নিরামিষ খাদ্যের এবং নিরামিষ খাদ্য প্রস্তুত এর গবেষণা সম্পর্কে বই পড়তে পার। তুমি ''নুতন আমেরিকার খাদ্য'' বইটি পড়তে পার। জন রবিনস্-এর লেখক। তিনি আইস্ক্রিম বিক্রী করে লাখপতি হয়ে ছিলেন। নিরামিষ ভোজী হওয়ার জন্য এবং তাঁর ব্যবসা এবং পারিবারিক ধারার বিরুদ্ধে নিরামিষ খাদ্য সম্পর্কে একটি বই লেখার জন্য তাঁর ত্যাগ করেছিলেন। এরজন্য তিনি প্রচুর অর্থ, সম্মান নষ্ট করেছিলেন এবং ব্যবসায় ক্ষতি স্বিকার করেছিলেন। কিন্তু সত্যের জন্য তিনি এটা করেছিলেন। এই বইটা খুব ভাল। অন্য অনেক বই এবং পত্রিকা আছে যা-থেকে তুমি নিরামিষ খাদ্য সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারবে এবং কিবাবে ইহা বিশ্বশান্তির সহায়ক হয় তাহা বুঝতে পারবে। দেখ আমরা পশুখাদ্য যোগানের জন্য আমাদের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছি। একটা গরুকে খাদ্য উপযোগী করতে গিয়ে আমাদের কত প্রোটিন, ঔষধ, জল প্রভৃতি খরচা করতে হয়, কত শ্রম দিতে হয়, কত রাস্তাঘাট তৈরী করতে হয় বা যানবাহন প্রযোজন হয় আর কত হাজার হাজার একর জমি নষ্ট করতে হয় তা কি তুমি জান। এ সমস্ত জিনিসগুলো অনুন্নত দেশগুলোতে সমানভাবে ভাগ করে দিতে পারা যেতো। তাহলে আমরা ক্ষুধার সমস্যা সমাধান করতে পারতাম.

এখন কোন দেশের খাদ্যের অভাব হয় তাহলে সেই দেশ নিজেদের অধিবাসীদের বাঁচাবার জন্যে অন্যদেশ আক্রমণ করবে। শেষপর্যন্ত এতে নানা অশান্তি সৃষ্টি হয়। **"যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে"।** আমরা যদি কাউকে খাদ্যের জন্যে হত্যা করি তাহলে পরবর্তীকালে, পররবর্তী প্রজন্মে আমরা ও ঐরূপভাবে নিহত হবো। এটা খুব দুঃখের ব্যাপার। আমরা এত বুদ্ধিমান, এত সভ্য অথচ আমাদের অধিকাংশ লোক জানে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর কষ্টের কারণ কি। এর আমাদের পেট, আমাদের মুখ। লোকের খাদ্যের জন্য, পুষ্টির জন্য আমরা এত জীব হত্যা করি, এত লোককে অনাহারে রাখি। আমরা এখনও প্রাণীদের কথা বলেনি তাহলে এই অপরাধটা আমাদের বিবেকের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসবে। তা সচেতনভাবে হোক বা অসেচেতনভাবেই হোক। এর ফলে আমরা ক্যানসার, যক্ষ্মা এবং এইড্স্ সহ অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবো। তুমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর, কেন তোমার নিজের দেশ অমেরিকা এত কষ্ট পাচ্ছে? পৃথিবীতে ক্যানসাররোগীর এখানে সর্বাপেক্ষা বেশী। এর কারণ হলো আমেরিকানরা প্রচুর গো-মাংস ভক্ষন করে। অন্য যে কোন দেশের থেকে তারা বেশী মাংস খায়। তুমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা কর কেন চীন অথবা অন্যান্য কমুনিষ্ঠ দেশগুলোতে ক্যানসার রোগের হার এত বেশী নয় কেন। এর কারণ তারা অত বেশী মাংস খায় না। আমি এটা বলছি না, গবেষণার দ্বারা এটা জানা গেছে। তাই আমাকে দোশ দিও না।

প্রশ্ন ঃ—নিরামিষ ভোজী হয়ে আমরা কি আধ্যত্মিক উপকার লাভ করতে পারি?

প্রভু ঃ—তুমি প্রশ্নটা এইভাবে করেছ সেজন্য আমি খুব খুশি কারণ এর অর্থ এই যে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তুমিম মনেনিবেশ করেছ। লোকে যখন নিরামিষ খাদ্যের কথা বলে তখন তারা স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং দৈহিক গঠনের সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। নিরামিষ খাদ্যের আধ্যাত্মিক দিক হলো এই যে এটা শুদ্ধ এবং অহিংস। **"তোমার হত্যা করা উচিত না।"** যখন ভগবান আমাদের এই কথা বলেন তখন তিনি বলেন না যে শুধু নরহত্যা করো না, তিনি বলেন কোন প্রাণী হত্যা করো না। তিনি কি বলেন না যে তিনি সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন আমাদের সাহায্য করার জন্যে আমাদের সহায় হওয়ার জন্য?

তিনি কি প্রাণীদের আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দেননি? তিনি বলেছিলেন এদের যত্ন করো এবং এদের শাসন করো। যখন তুমি প্রজাদের শাসন কর তখন কি তাদের হত্যা কর এবংভক্ষন কর? তাহলে তুমি হতে একজন প্রজাবিহীন রাজা। তাহলে এখন বুঝতে পারছ ভগবান একথা বলেছেন এবং আমরা অবশ্যই সেইমত করবো। তাঁকে প্রশ্ন করার কিছু নেই তিনি খুব পরিস্কারভাবে একথা বলেছেন। সুতরাং ঈশ্বরকে বোঝার জন্য এখন তোমাকে ঈশ্বর হতে হবে। আমি তোমাকে ঈশ্বরের মতো হওয়ার জন্য আমন্ত্রন জানাচ্ছি। ঈশ্বরের তপস্যা করার অর্থ এই নয় যে তুমি ঈশ্বরের আরাধনা করছো। এর অর্থ এই যে তুমিও ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েছ, তোমার সঙ্গে ঈশ্বরের একাত্মতা অনুভব করেছো। **"আমি এবং আমার পিতা একাত্ম"**, যিশু কি এই কথা বলেন নি। তিনি যদি বলে থাকেন তিনি তাঁহর পিতা একাত্ম তাহলে আমি এবং তাঁহার পিতাও একাত্ম তাহলে আমি এবং তাঁহার পিতাও একাত্ম হতে পারে কারণ আমরা ঈশ্বরেরও পুত্র। ভগবান যিশু আরও বলেছেন তিনি যা করেছেন আমরা তার থেকে ভালো কিছু করতে পারি। সুতরাং কে জানেআমরা তার থেকে ভালো কিছু করতে পারি। সুতরাং কে জানে আমরা হয়তো ঈশ্বরের থেকে মহান কিছু হতে পারি। ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা যখন কিছু জানি না তখন কেন আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি। কেন অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখি। আমরা প্রথমে জানবো আমরা যাঁর আরাধনা করছি তিনি কে। যেমন কোন মেয়েকে বিয়ে করার আগে আমরা জানবো মেয়েটিকে। আজকাল একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা পূর্বপরিচয় ছাড়া বিয়ে করি না। তাহলে আমরা কেন অন্ধবিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরকে পূজা করবো। ঈশ্বরকে আমাদের সামনে উপস্থিত হতে এবং নীজেকে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করতে আমরা দাবী করতে পারি। কোন্ ঈশ্বরকে আমরা পূজা করবো তা বেছে নেওয়ার অধিকার আমাদের আছে। তাহলে এটা দেখছ যে বাইবেলে পরিস্কারভাবে আছে যে আমাদের নিরামিষ হওয়া উচিত। সমস্ত বৈজ্ঞানিক কারণেও আমাদের নিরামিষ ভোজী হওয়া উচিত। সমস্ত অর্থনৈতিক কারণের জন্য আমাদের নিরামিষ ভোজী হওয়া উচিত. সমস্ত হৃদয়বৃত্তির কারণে আমাদের নিরামিষ ভোজী হওয়া উচিত। একটা অনুসন্ধানে জানা গেছে যে পাশ্চাত্য. অথবা আমেরিকার লোকেরা যদি সপ্তাহে একদিন নিরামিষ আহার

করে তবে তার দ্বারা এক কোটি যাট লক্ষ আনাহারক্লিষ্ট লোককে এক বছর বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। সুতরাং বীর হত, নিরামিষ ভোজী হও। এতসব কারণের পরেও যদি তুমি আমার উপদেশ না শোনো তাহলে অন্তত তোমার নিজের জন্য, পৃথিবীর জন্য নিরামিষ ভোজী হও।

প্রশ্ন ঃ—যদি প্রত্যেক শাক-সবজি আহার করে তাহলে কি খাদ্য সংকট সৃষ্টি হবে? একখণ্ড জমিতে খাদ্য ফসল চাষ করলে তা ঐ জমিতে উৎপাদিত পশুখাদ্যেবচৌদ্দ গুনের সমান। এক একর জমির শাক-সবজিতে ৮০০.০০০ ক্যালরী শক্তি পাওয়া যায় কিন্তু সেই জমিতে উৎপাদিত পশুখাদ্য আহার করে যে পশু বড় হয় তার মাংস মাত্র ২০০০০০ ক্যালরী শক্তি দিতে পারে। এর মানে এই যে এইভাবে আমাদের ৬০০০০০ ক্যালরী শক্তি নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং আমিষ খাদ্য থেকে নিরামিষ উপযোগী এবং এতে খরচও বাঁচে।

প্রশ্ন ঃ—নিরামিষ ভোজীর কি মাছ খাওয়া চলতে পারে?

প্রভু ঃ—তুমি যদি মাছ খেতে চাও তো ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যদি নিরামিষ ভোজী হতে চাও তবে মাছ নিরামিষ নয়।

প্রশ্ন ঃ—কিছু লোক বলেন যে সহৃদয় ব্যক্তি হওয়া দরকার, নিরামিষ ভোজী হওয়ার **প্রয়োজন** নেই। এর কি কোন অর্থ আছে?

প্রভু ঃ—একজন লোক যদি সত্যিই সহৃদয় হন তবে তিনি অন্যপ্রাণীর মাংস খাবেন কেন? তাদের কষ্ট দেখে তিনি তো তাদের খেতেই পারবেন না। মাংস ভক্ষন হৃদয়হীনতার কাজ, তাই একজন হৃদয়বান ব্যক্তি একাজ করবেন কি করে? প্রভু লিয়েন-চিঙ-হাই একবার বলেছিলেন **"এক হত্যা করো ও এর মাংস খাও। এই পৃথিবীতে এর চেয়ে নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপরায়ন, হৃদয়হীন ও অনিষ্টকারী ব্যক্তি আর কেউ নেই। কি ভাবে সে দাবী করবে যে সে একজন হৃদয়বান ব্যক্তি?"** মেনাসিয়াস ও বলেছেন যদি তুমি একে জীবিত দেখ তবে একে মৃত দেখা তুমি সহ্য করতে পারো না। আর যদি তুমি একে যন্ত্রনায় কাতর দেখ তবে তুমি এর মাংস খেতে পারো না। তাই একজন প্রকৃত ভদ্রলোক রান্নাঘর থেকে দূরে থাকবে"। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি প্রাণীদের থেকে শ্রেষ্ঠ তাই তাই আমরা অস্ত্রের সাহায্যে তাদের বাধাদান থেকে নিবৃত্ত করতে পারি তাই আমাদের প্রতি ঘনা নিয়ে তারা মত্যমুখে পতিত হয় তাই যে সব লোক

একাজ করে। ক্ষুদ্র ও দুর্বল প্রাণীদের হত্যা করে তাদের ভদ্রলোক বলা যায় না। তাই যখন তারা আমাদের প্রতি প্রবল ঘৃনা ভয় নিয়ে মরে। এর ফলে তাদের মাংসে একরকম বিষক্রিয়া হয় যা তাদের যারা আহার করে তাদের ক্ষতি করে। আর যেহেতু মানুষের কম্পাংক অপেক্ষা তাদের কম্পাংক কম, তাদের কম্পাংক আমাদের কম্পাংককে প্রভাবিত করে ও আমাদের বৌদ্ধিক বিকাশকে ব্যাহত করে।

প্রশ্ন ঃ—তথাকথিত সুবিধাবাদী নিরামিষ ভোজী হওয়া কি ঠিক? (সুবিধাবাদী নিরামিষ ভোজী কঠোরভাবে মাংস ভোজন পরিহার করেন না। তাঁদের খাদ্যে মাংস ও শাক-সবজি দুই-ই থাকে।)

প্রভু ঃ—না, যেমন যদি তোমার খাদ্যে বিষাক্ত তরল মেশানো হয় ও পরে চেলে নেওয়া হয় তাহলে ঐ খাদ্য তখনও বিযাক্ত থাকবে না থাকবে না? মহাপরিনির্বান সূত্রে মহাকাশ্যপ বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করিছিলেন — **"যখন আমরা ভিক্ষা করি এবং যখন আমাদের মাংস মেশানো শাক-সবজি দেওয়া হয় আমরা কি তখন ঐ খাদ্য খেতে পারি?** বুদ্ধ বলেছিলেন — "একে জলে পরিস্কার করে মাংস ও শাক-সবজি আলাদা করে তারপর খাওয়া উচিৎ।" এই কথোপকথন থেকে আমরা বুঝতে পারি মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, মাংস মেশানো শাক-সবিজ থেকে মাংস আলাদা করে, জলে পরিস্কার না করে শাক-সবজিও খাওয়া উচিৎ নয়। সুতরাং এ থেকে সহজেই বুঝা যায় বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করতেন। কিন্তু কেউ কেউ বুদ্ধকে সুবিধাবাদী নিরামিষ ভক্ষনকারী বলে অপবাদ দিয়ে থাকেন এবং কেউ যদি তাঁকে মাংস ভিক্ষা দিতেন তাহলে তিনি মাংস খেতেন। এটা সত্যিই মুর্খের মত কথা। এটা যাঁরা বলেন তারা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সামান্যই পড়েছেন ও তার অর্থ বুঝতে পারেন নি। ভারতবর্ষে ৯০% এর বেশী লোক নিরামিষ ভোজী। যখন লোকে গেরুয়া কাপড় পড়া সাধু দেখেন তখনই তাঁরা বোঝেন তাঁকে নিরামিষ খাদ্য দিতে হবে। অবশ্য বলা নিষ্প্রয়োজন যে অধিকাংশ লোকের দেওয়ার মত মাংস থাকে না।

প্রশ্ন ঃ— অনেকে বলে "বুদ্ধ শুকরের ঠ্যাং খাও ও তাতে তাঁর উদারময় হয় যাতে তিনি মারা যান", এটা কি ঘটনা?

প্রভু ঃ— মোটেই নয়। এক ধরণের ছত্রাক খেয়ে বুদ্ধদের মারা যান। যদি বুদ্ধের ভাষা সরাসরি অনুবাদ করি তাহলে আমরা জানতে পারি যে এই ধরণের ছত্রাকের নাম "শুকরের ঠ্যাং", এটা সত্যিকারের শুকরের ঠ্যাং নয়। এক ধরণের ফল আছে যাকে আমরা বলি ড্রাগনের চোখ। এটা সেইরকমের কথা। অনেক ধরণের জিনিস আছে যাদের নাম দেখে মনে সেগুলো শাক-সবজি নয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো নিরামিষ। যেমনটা হলো ড্রাগনের চোখ। এই ধরণের ছত্রাককে ব্রাহ্মন্য ভাষায় বলা হয় "শূকরের ঠ্যাং" বা "শূকরের আনন্দ" দুটোর সঙ্গেই শূকরের সম্পর্ক আছে। এই ধরণের ছত্রাক প্রাচীন ভারতে সহজলভ্য ছিল না — ছিল দুস্প্রাপ্য। তাই বুদ্ধদেবের পূজার জন্য এটা বুদ্ধদেবকে দেওয়া হয়েছিল। এই ছত্রাককে মাটির উপরে দেখা যায় না। এটা মাটির নীচে জন্মায়। এটাকে খুঁজতে গেলে তাদের শূকরের সাহায্য নিতে হয় কারণ এই ধরণের ছত্রাক শূকরেদরে অত্যন্ত প্রিয়। শূকরেরা গন্ধ শুঁকে এদের খুঁজে বের করে এবং এর খোঁজ পেলে পাদিয়ে মাটি খুঁড়ে তাদের বের করে ও খায় সেই জন্য এদের নাম দেওয়া হয়েছে "শূকরের আনন্দ" বা "শূকরের ঠ্যাং"। প্রকৃতপক্ষে এই দুই ধরণের ছত্রাক একই জিনিস। অসাবধানতার সঙ্গে অনুবাদ করার জন্য বা এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ না জানার জন্য পরবর্তী প্রজন্মের লোকেদের এই ভুল হয়েছে ও তারা বুদ্ধদেবকে মাংস ভক্ষনকারী বলে ভুল করেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার।

প্রশ্ন ঃ—কোন কোন মাংস প্রেমিক বলেন তারা কথাই এর কাছ থেকে মাংস কেনেন। তাই এটা খাওয়াতে কোনও দোষ নেই। আপনি কি মনে করেন এটা ঠিক?

প্রভু ঃ—এটা একটা বেদনাদায়ক ভুল। তোমাদের জানা উচিত যে লোকে মাংস খেতে চায় বলেই কষাই পশুহত্যা করে। লংকাভত্র সূত্রে বুদ্ধ বলেছেন — **"যদি মাংস ভোজী লোক না থাকত তাহলে কোনও পশু হত্যা হোতো না। তাই মাংস খাওয়া ও প্রাণী হত্যার পাপ একরকম"**। ব্যাপক পশুহত্যার ফলে আমাদের ব্যাপক দুর্গতি, মনুয্যসৃষ্ট দুর্বিপাক আসে। অত্যধিক পশুহ্যতার ফলেই যুদ্ধ ঘটে।

প্রশ্ন ঃ—কিছু লোক বলেন যে গাছ ইউরিয়ার মত বিষাক্ত জিনিষ তৈরী করতে পারে না, চাষীরা অনেক জীবানুনাশক গাছে ব্যবহার করে যা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে

ক্ষতিকর। এটা কি ঠিক?

প্রভু ঃ—চাষীরা যদি ডি. ডি. টির মমত অতি বিষাক্ত জিনিস গাছে ব্যবহার করে তবে তা থেকে ক্যানসার, বন্ধ্যাত্ব, যকৃতের নানা অসুখ হতে পারে। ডি.ডি. টির মত বিষ চর্বির সঙ্গে মিশে যায় ও প্রাণীর চর্বিতে জমতে থাকে। যখন তোমরা মাংস খাও তখন প্রাণীর চর্বিতে সঞ্চিত এইসব জীবানুনাশক বা অত্যন্ত বিষাক্ত দ্রব্য গ্রহণ কর। ফল, শাক-সবজি ও দানা শষ্যে এই সঞ্চয় তেরগুণেরও বেশী হতে পারে। ফলের গায়ে লেগে থাকা জীবনুনাশক আমরা ধুয়ে পরিস্কার করতে পারি কিন্তু প্রাণীর চর্বিতে সঞ্চিত বিষ আমরা দূর করতে পারি না। এই সঞ্চয় পদ্ধতি ঘটতে থাকে কারণ এই বিষগুলোর প্রকৃতি ক্রমবর্দ্ধমান। তাই খাদ্যশৃঙ্খলের শীর্ষে অবস্থিত মানুষেই সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লোওয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে মানুষের দেহে পাওয়া জীবানুনাশকের অধিকাংশই মাংস ভক্ষন থেকে এসেছে। তাঁরা দেখেছেন যে জীবানুনাশক বিষ মাংস ভোজীদের তুলানায় নিরামিষ ভোজীদের দেহে অর্ধেক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে মাংসে কীটনাশক বিষ ছাড়াও অন্যান্য বিষও থাকে। পশুপালন করার সময় পশুখাদ্যে নানারকম রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয় যার উদ্দেশ্য হোলো মাংসে বৃদ্ধি দ্রুততর করা ও মাংসের রং, আস্বাদ ও গঠনের পরিবর্তন করা। যেমন নাইট্রেট থেকে উৎপন্ন খাদ্য-সংরক্ষণ আরক অত্যন্ত বিষাক্ত। ১৮ ই জুলাই, ১৯৭১ সালে নিউইয়র্ক টাইম্‌স্ এ বলা হয়েছে — ‘‘মাংস ভোজীদের বিষম বিপদের কারণ হলো মাংসে অদৃশ্য দূষণ পদার্থ। এগুলো হলো স্যামন মাছের মধ্যে থাকা বীজানু, কীটনাশকের অবশিষ্ট অংশ, সংরক্ষণ পদার্থ, হরমোন, জীবানুনাশক ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক যৌগ। এগুলো ছাড়াও প্রাণীদের প্রতিষেধক দেওয়া — তার কিছু অংশও মাংসে থেকে যেতে পারে। কিন্তু ফল, বাদাম, শুটি, দানাশষ্য এবং দুধে প্রোটিন থাকে তা মাসের প্রোটিন অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ। মাংসের প্রোটিন ৫৬ জলে অদ্রবণীয় দুষিত পদার্থ থাকে। গবেষণার দ্বারা দেখা গেছে মানুষের তৈরী যোগপদার্থ দ্বারা ক্যানসার ও অন্যান্য অসুখ হতে পারে এবং গর্ভস্ত ভ্রুনের অঙ্গ বিকৃতি ঘটতে পারে। তাই গর্ভস্থ ভ্রুনের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সন্তান সম্ভবা মায়েদের খাঁটি নিরামিষ খাদ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বেশি দুধ খেলে যথেস্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম, শুটিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন এবং ফল ও শাক-সবজিতে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়।